পুলিশ কাহিনী–এক

সনতোষ বড়ুয়া

পুলিশ নিয়ে অনেক অভিযোগ ও তিক্ততা আমাদের। তবে প্রতিষ্ঠান হিসেবে পুলিশ নিপীড়ক যন্ত্রের একটি খন্ড, আর ব্যক্তি পুলিশ এই সমাজেরই নানাপ্রান্তের মানুষ। এই ধারাবাহিক লেখায় পুলিশ বাহিনীর ভেতরের জগত তুলে ধরছেন এক সাবেক পুলিশ কর্মকর্তা।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) বর্তমান চেয়ারম্যান, চবির সাবেক উপাচার্য মান্নান স্যার অনেক আগে তাঁর এক কলামে লিখেছিলেন, পুলিশ অপমৃত্যু মামলার মতো দুঃখজনক মামলায়ও ঘুষ খায়। লেখাটি আমি পড়েছিলাম, পড়ে কিছুটা কষ্টও পেয়েছিলাম; কারণ আমি তখন পুলিশে চাকরি করছিলাম। শুধু বাংলাদেশ কেন, বিশ্বের অনেক উন্নত দেশেও পুলিশের ভূমিকা সন্তোষজনক নয়। তবে ঘুষ বাণিজ্যে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান একই কাতারে। এই ঘুষ বাণিজ্যের কারণেই বাংলাদেশের পুলিশের সমস্ত ভালো কাজের সুনাম শূন্য হয়ে যায়। শুধু তা-ই নয়, মুখের ভাষা খারাপের জন্যও পুলিশের অনেক ভালো কাজের সুনাম নষ্ট হয়ে যায়। মানুষ অত্যন্ত বিপদের সময়ে পুলিশ ও চিকিৎসকের কাছে যায়, আর সেখানে যদি ভালো ব্যবহার না পায় মানুষ সেটা ভোলে না, ভুলতে পারে না। ভোলার কথাও নয়।

যেহেতু বাংলাদেশের পুলিশের সুনাম নেই, তাই পুলিশের বিরুদ্ধে প্রচার হওয়া সকল প্রকার অপকর্মের কথাই পাঠকপ্রিয়তা পায়। অপমৃত্যু মামলা তদন্তে পুলিশের টাকা নেওয়া না নেওয়ার বিষয়টি আজ বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে ব্যাখ্যা করব।

১৯৮৮ সালে সারদা পুলিশ একাডেমিতে প্রশিক্ষণ শেষে ১৯৮৯ সালে আমি যোগদান করি মৌলভীবাজার জেলায়। নতুন এসআইদের প্রথম দুই বছর হলো মামলা তদন্ত ও ব্যবস্থাপনার শিক্ষানবিশ সময়। এই সময়ে মামলা তদন্ত ভালোভাবে শেখা না হলে সেই অফিসারের তদন্ত আর ভালো হয় না। সে যা-ই হোক, আমি পুলিশ জীবনের প্রথমে যে মামলার তদন্তে গিয়েছিলাম সেটা ছিল অপমৃত্যু মামলার তদন্ত। অপমৃত্যু মামলার তদন্ত হত্যা মামলা তদন্তের চেয়েও কঠিন। কারণ হত্যা মামলায় হত্যার মোটিভ, হত্যার আলামত প্রকাশিত থাকে, কিন্তু অপমৃত্যু মামলা হতে পারে হত্যামূলক, হতে পারে আত্মহত্যামূলক। সূক্ষ্ম তদন্তে নিশ্চিত হতে হয়, ভিকটিমের মৃত্যু হত্যামূলক নাকি আত্মহত্যামূলক। এক্ষেত্রে অপরাধবিজ্ঞান যতটুকু না সহায়তা করে, তার চেয়ে বেশি সাহায্য করে দক্ষ পুরনো অফিসারের অভিজ্ঞতা।

সেদিন সকালে থানায়ই ছিলাম। দশটা-এগারোটার দিকে থানায় খবর আসে, সাধুহাটি গ্রামে ৪০-৪৫ বয়সের এক মধ্যবয়সী লোক ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছে। যথারীতি অপমৃত্যুর মামলা রুজু হবার পর আমি তদন্তকারী এসআই ইসহাক সাহেবের সাথে সেই অপমৃত্যু মামলা তদন্তের প্রশিক্ষণে রওনা হই। সকাল থেকেই বৃষ্টি হচ্ছিল। গ্রামের কাঁচা রাস্তা, মেঠোপথ ছিল অনেকটা চলাচলের অনুপযোগী। যখন ঘটনাস্থলে পৌঁছাই, মৃতদেহ তখনো গোয়ালঘরের বাঁশের সাথে ঝুলছিল। তদন্তকারী অফিসার ঝুলন্ত অবস্থায়ই মৃতদেহের সুরতহাল রিপোর্ট তৈরি করলেন। তারপর নামানো হয় ঝুলন্ত অবস্থা থেকে। সুরতহাল রিপোর্ট তৈরি করার সময় অফিসার আমাকে দেখালেন মৃতের গলায় ফাঁসির রশির দাগ আছে কি না। যদি না থাকে তাহলে ধরে নিতে হবে, অন্য কোনোভাবে মৃত্যুর পর মৃতদেহ রশিতে ঝোলানো হয়েছে। তারপর দেখালেন জিহ্বা বের হয়ে আছে কি না। কেউ ফাঁসিতে মারা যাবার সময় মৃত্যুর একসময় বাঁচার চেষ্টা করে, জিহ্বা বের করে শ্বাস নেবার চেষ্টা করে। সে কারণে ফাঁসি খেয়ে মারা যাওয়া ব্যক্তির জিহ্বা বের হয়ে থাকে।

এরপর অফিসার মৃতের বাড়ির সদস্যদের এবং আশেপাশের লোকজনকে নানা বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। সব বিষয়ে কাগজে নোট নিলেন। ঘটনাস্থলে তদন্ত শেষে অফিসার সিদ্ধান্ত নিলেন, মৃতদেহ ময়নাতদন্ত করতে হবে, কারণ ময়নাতদন্ত ছাড়া তিনি আত্মহত্যা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারছেন না। ময়নাতদন্তের কথা শুনেই যেন আকাশ ভেঙে পড়ল পরিবারের ওপর। আকাশ তো এমনিই ভেঙে পড়ে আছে। বাকি আছে কী আর? আকাশ ভেঙে পড়েছে এজন্য যে, এই মৃতদেহ সদর হাসপাতালে আনা-নেওয়ার খরচ বহন করবে কে? এলাকার মেম্বার সাহেবও বোঝানোর চেষ্টা করছেন ময়নাতদন্ত ব্যতীত যদি কোনো ব্যবস্থা করা যায়। পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ব্যক্তিটিই মারা গেল, কাল কী খাবে সেই ব্যবস্থাও যাদের নেই, তারা ময়নাতদন্তের খরচ জোগাবে কি!

প্রশ্ন এখানেই–ময়নাতদন্তের আবার খরচ কি? খরচ থাকলেও সেটা মৃতের পরিবার বহন করবে কেন? পুলিশ মৃতদেহ নিয়ে যাবে, সরকারি হাসপাতালে করা হবে ময়নাতদন্ত; তাহলে আবার খরচ কিসের? এ বিষয়ে সেদিন ধারণা ছিল না আমারও।

দেখলাম এই মৃতদেহ গ্রাম থেকে শহরে সদর হাসপাতালে আনা-নেওয়ার কোনো বাহন নেই। রিকশাভ্যানে আনা-নেওয়ার যা খরচ শুনলাম, সেটা এসআই সাহেবের মাসিক বেতনের চেয়েও বেশি। এ তো গেল পরিবহন ব্যয়। সদর হাসপাতালে ময়নাতদন্তের আগে দিতে হবে ডোমের খরচ। লাশ কাটবে ডোম, তারপর ময়নাতদন্ত করবে ডাক্তার। ডোম আগে মদ পান করবে, তারপর কাটবে লাশ। না হলে সে লাশই কাটবে না। ডোমের খরচ ক্ষেত্রবিশেষে তিন শ থেকে পাঁচ শ টাকা। মৃতের আত্মীয়স্বজন সাথে থাকলে একটু বেশি দিতে হয়, তা না হলে ময়নাতদন্ত শেষে কাটা মৃতদেহ ডোম আর সেলাই করবে না। সে আরেক বিপদ। ডোমের ওপর হাসপাতালের নাকি কারোরই নিয়ন্ত্রণ নেই। আর লাশকাটা ঘর যদি হাসপাতাল থেকে একটু দূরে হয়, তাহলে ডাক্তার সাহেবের আসা-যাওয়ার যানবাহনের ব্যবস্থাও করতে হবে। সব মিলিয়ে দেখা গেল আড়াই কি তিন হাজার টাকার ধাক্কা। দেখলাম চাঁদা তোলা হলো, এলাকার মেম্বার সব ব্যবস্থা করলেন। সিদ্ধান্ত হলো, লাশের সাথে আত্মীয়স্বজন কেউ যাবে না, তাতে খরচ বাড়বে। যে রিকশাভ্যান লাশ নিয়ে যাবে, সেটাই ময়নাতদন্ত শেষে লাশ পুনরায় পৌঁছে দিয়ে যাবে। রিকশাভ্যান ভাড়া করা হলো আনা-নেওয়ার।

দেখলাম এই মৃতদেহ গ্রাম থেকে শহরে সদর হাসপাতালে আনা-নেওয়ার কোনো বাহন নেই। রিকশাভ্যানে আনা-নেওয়ার যা খরচ শুনলাম, সেটা এসআই সাহেবের মাসিক বেতনের চেয়েও বেশি। এ তো গেল পরিবহন ব্যয়। সদর হাসপাতালে ময়নাতদন্তের আগে দিতে হবে ডোমের খরচ। লাশ কাটবে ডোম, তারপর ময়নাতদন্ত করবে ডাক্তার। ডোম আগে মদ পান করবে, তারপর কাটবে লাশ।

ঘটনা কী দাঁড়াল? জনগণ দেখল–মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য এলাকায় চাঁদা তোলা হলো, পুলিশকে দেওয়া হলো। মানুষ দেখল–পুলিশ ঘুষ খায় সত্য, সেটা মানুষ মারা গেলেও?

আমি অনেক ময়নাতদন্তকারী পুলিশের কনস্টেবল দেখেছি ময়নাতদন্ত শেষে থানায় ফিরে এসে খরচ না হওয়া টাকা অফিসার বা মৃত ব্যক্তির লোকজনকে বুঝিয়ে দিচ্ছে। কারণ লাশের টাকা সে খাবে না। কিন্তু সব পুলিশ যে খায় না তা-ও তো নয়। কিন্তু কেউ কেউ যে খায় না, সেটা মানুষ জানে না।

প্রশ্ন তো থেকেই যায় যে ময়নাতদন্তের জন্য কি সরকারি টাকার ব্যবস্থা নেই? আছে, থাকবে না কেন। সেটা হলো, ময়নাতদন্তকারী অফিসার প্রথমে খরচ করবেন, তারপর বিল সাবমিট করলে জেলা প্রশাসক তাঁর ময়নাতদন্ত ফান্ড থেকে বিল পে করবেন। কিন্তু শুরুতেই এত টাকা খরচ করবে কে? তাই

স্থানীয়ভাবেই পুলিশ কর্ম সারে (এখন অবশ্য সেই অবস্থা আর নেই, থানায় থানায় টাকা বরাদ্দ দেওয়া আছে সকল প্রকার মামলা তদন্তের জন্য)।

আছে আরও নানা ঝামেলা। পুলিশ ময়নাতদন্তের বিল দাখিল করলেই তো আর টাকা পাবে না। তাকে বিলের সাথে ২০ বা ৩০ পার্সেন্ট অগ্রিম দিয়ে দিতে হবে বিল পাস করার জন্য। না দিলে নানা কোয়ারিসহ ফেরত আসবে সেই বিল। পাওয়া যাবে দাখিল করার পাঁচ থেকে ছয় মাস পর। সুতরাং পকেটের টাকা খরচ করে পুলিশও পাঁচ-ছয় মাস বসে থাকতে চায় না। ধরে নিয়েছিলাম মান্নান স্যার বোধ হয় এই ময়নাতদন্তের খরচের বিষয়টি পুলিশের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিলেন। আমার জানা মতে, পুলিশ ঘুষ খেলেও অপমৃত্যু মামলা বা ময়নাতদন্তের জন্য টাকা নিয়ে খেয়ে ফেলে–এরকম কখনো দেখিনি। কিন্তু অন্যান্য বেলায় পুলিশ তুলসীপাতা নয়, একথা মানুষ জানে।

গাড়ি রিকুইজিশন

আরেক বিরক্তিকর বিষয় পুলিশের গাড়ি রিকুইজিশন। অনেক কারণেই পাবলিকের যানবাহন পুলিশ রিকুইজিশন করে থাকে। কোনো নির্বাচনের সময় ভোটের বাক্স, পুলিশ-আনসারসহ নানা বাহিনী কেন্দ্রে আনা-নেওয়া, টহল দেওয়া–সব কাজেই একসাথে অনেক গাড়ি প্রয়োজন হয়। কিন্তু সরকারের এত গাড়ি থাকে না, সুতরাং পাবলিকের গাড়িই ভরসা। নিয়ম অনুযায়ী কোনো গাড়ি রিকুইজিশন করা হলে যে ক'দিন সেই গাড়ি রিকুইজিশনে রাখা হবে, সেই ক'দিনের ভাড়া মালিককে পরিশোধ করতে হবে, জ্বালানি এবং চালক-হেলপারের খাওয়াদাওয়া–সবই সরকারি বরাদ্দ থেকে প্রদান করতে হবে। এটা করা হয় না বলে জনগণ রিকুইজিশনের বদনাম করে।

তাছাড়া গাড়ি রিকুইজিশনের সময় দুর্নীতিরও কিছু সুযোগ থাকে। সবাই চায় রিকুইজিশনে না যেতে, কারণ ভাড়া বাবদ সরকারি বরাদ্দের কিছুই তারা পাবে না। সে কারণে দেখা যায়, রিকুইজিশনকারী অফিসারকে কিছু ধরিয়ে দিয়ে সবাই পার পেতে চায়। আর পুলিশ এই সুযোগটা নেয় এবং দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ে। আরও যা লক্ষণীয় সেটা হলো, দেখা যাবে তদবিরে কাজ হয় না, টাকা দিলেই কাজ হয়। কিন্তু যেসব অফিসার সরকারি এই বরাদ্দের টাকা মেরে দেন, তাঁদের কথা কেউ জানে না। তাঁরা ধোয়া তুলসীপাতা সেজে বসে আছেন যুগ যুগ।

> একজন কনস্টেবল যদি লাখ লাখ টাকা ব্যয় করে পদোন্নতি নেয়, পোস্টিং নেয়, তাহলে তারা তো সেই টাকা উসুল করে নেওয়ার চেষ্টায় থাকবে এবং সেটাই স্বাভাবিক।

পুলিশের তদবির-পুলিশকে তদবির

বাংলাদেশে সরকারি চাকরিতে নিয়োগ বাণিজ্য এখন বিপজ্জনক অবস্থায় আছে। তাই বলা যায়, সরকারি চাকরিতে নিয়োগ বাণিজ্যের অবস্থা এখন রমরমা। এই ব্যবসা নতুন নয়, এটা এদেশে চলছে অনেক দিন ধরে। তবে চাঙ্গা হচ্ছে দিন দিন এই যা। টাকার লেনদেন ছাড়াও এখানে দুর্নীতি হতে পারে। কারো সুপারিশে যদি অযোগ্য কোনো লোকের কোনো পদে নিয়োগ হয়, তাহলে সেটাও দুর্নীতি। কারণ অযোগ্য লোকের চাকরি হওয়াও দুর্নীতি। তাই সব দুর্নীতিতে আর্থিক লেনদেন না-ও থাকতে পারে।

এর ব্যতিক্রমও একসময় বা মাঝে মাঝে ছিল। এখনো দু-একটি আছে। আমি যখন বাংলাদেশ পুলিশে যোগদান করার জন্য পরীক্ষায় অবতীর্ণ হই, তখন জেনারেল এরশাদের শাসনকাল। অনেকেই বলছিল, ঘুষ ছাড়া পুলিশে চাকরি সম্ভব নয়। মনে মনে ঠিক করেছিলাম পরীক্ষা দিয়েই দেখি, চাকরি হলে হবে, না হলে নাই। সেদিন দেখেছিলাম, পুলিশেও ঘুষ না খাওয়া লোকজন আছে। তবে এদের সংখ্যা হাতে গোনা। আমাদের সময় চট্টগ্রাম রেঞ্জে এসআই নিয়োগের দায়িত্বে ছিলেন রেঞ্জের ডিআইজি শহুদুল হক। তিনি বাংলাদেশ সেনাবাহিনী থেকে পুলিশে আসা অফিসারদের একজন। জিয়াউর রহমান কেন তাঁদের পুলিশে এনেছিলেন তা জিয়াউর রহমানই জানেন। আমাদের শারীরিক যোগ্যতা যাচাই, লিখিত পরীক্ষা, মৌখিক পরীক্ষা শেষে যখন চূড়ান্ত নিয়োগের জন্য তালিকা প্রকাশ করা হলো, তখন সেখানে বাণিজ্যের কিছুই তো টের পেলাম না। দুপুরে ভাইভা নিয়ে যদি সন্ধ্যায় নির্বাচিতদের তালিকা প্রকাশ করা হয়, তাহলে বাণিজ্যের আর সময়ই বা কোথায়। এর মানে এই নয় যে, সে সময় বাণিজ্য ছাড়া চাকরি হয়েছে। এটা নির্ভর করেছে মূলত অফিসারের খাছলতের ওপর। এরপরও দেখেছি, যারা পরীক্ষায় নির্বাচিত হয়নি তারা বলেছে–ঘুষ না দেওয়ায় তাদের চাকরি হয়নি। যারা পরীক্ষায় পাস করে না তারা বোধ হয় সব সময় একথাই বলে। কিন্তু পুলিশে লোক নিয়োগের এই ধারা পরবর্তীতে আর বজায় ছিল না। সামরিক বাহিনী থেকে আসা একজন অফিসার ঘুষ খাননি মানে সামরিক বাহিনী থেকে আসা সব অফিসারই যে সৎ ছিলেন তা নয়। পরবর্তীতে চাকরিকালে দেখেছি, ডিআইজি শহুদুল হক (পরে তিনি আইজিপি হয়েছিলেন), মতিয়া চৌধুরীর ভাই শহিদুল ইসলাম চৌধুরীসহ কয়েকজন ছাড়া বাকিরা সবাই ঘুষখোর, দুর্নীতিপরায়ণ ছিলেন। শুধু দুর্নীতি নয়, অনেকে নারীলিপ্সুও ছিলেন।

কোনো দেশে ক্ষমতাসীন বা ক্ষমতার বাইরে থাকা রাজনীতিবিদরা যদি দুর্নীতিপরায়ণ হয়, দেশের মঙ্গলের চেয়ে নিজের পারিবারিক মঙ্গল বেশি কামনা করে, সেই দেশে সরকারি আমলা-কামলা সবাই দুর্নীতিপরায়ণ হয়। কারণ দুর্নীতিতে সরকারি অনুমোদন লতাপাতায় লাগা হাওয়া-বাতাসের মতো। লোভের লতার আগা লকলকিয়ে বেড়ে ওঠে। আমাদেরও আজ সেই অবস্থা। শুধু পুলিশ বিভাগে নয়, বিচার বিভাগ থেকে শুরু করে শিক্ষা–সবখানেই দুর্নীতি ছাড়া অল্পসংখ্যক লোকই কাজ করে। কাউকে কাউকে বলতে শুনি, যেসব অফিসার দুর্নীতিবাজ তাঁরাই কাজে দক্ষ। ঘুষ না খাওয়া অফিসাররা যেনতেনভাবে কাজ সারেন। কারণ তাঁরা ঘুষ খান না বলে ভালো কাজেরও তোয়াক্কা করেন না। এটাও আবার সমর্থনযোগ্য নয়। কারণ ঘুষ না খাওয়া ভালো, তাই বলে নিজ কর্ম সুচারুভাবে সম্পন্ন না করাও তো দুর্নীতি। কারণ তিনি বেতন নিচ্ছেন তো দায়িত্ব যথাযথভাবে সম্পন্ন করার জন্যই।

সে যা-ই হোক, আজকাল দেখা যায় দুর্নীতিতে সরকারি এক বিভাগ আরেক বিভাগের সাথে হাতে হাত রেখে চেইন গড়ে তুলেছে। এই চেইন গঠনে যুক্ত হয়েছে ক্ষমতাসীন রাজনীতির সাথে জড়িত ব্যক্তিরাও। দুর্নীতিতে দ্রুত অর্থ কামানোর জন্য কী ভীষণ প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে সেটা আজ একজন নিরীহ নাগরিকও বোঝে। না বোঝার মতো কঠিন বিষয় দুর্নীতি নয়। কিন্তু দেখবেন কোনো আড্ডায় যখন দেশের দুর্নীতি নিয়ে কথা ওঠে, তখন সেখানে উপস্থিত সবাই এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলবে, বলবে তারা এসবের সাথে জড়িত নয়। এই দুর্নীতির কারণেই দেশের আজ এই অবস্থা। খবর নিলে দেখা যাবে, যাঁরা এই অবৈধ লেনদেনের বিরুদ্ধে কথা বলেন তাঁদের অনেকেই আবার এর সাথে জড়িত। দু-একজন ব্যতিক্রম অবশ্য সবখানেই আছে।

বাস্তব অভিজ্ঞতার কথাই বলি। পুলিশ অফিসাররা যখন কোনো ট্রেনিংয়ে যান, সেখানে অনেক বন্ধুই একসাথে হন। গল্প হয় ট্রেনিংয়ের ফাঁকে ফাঁকে। পুলিশ অফিসাররা যখন গল্প করেন, তখন অন্য অফিসারের দুর্নীতির নানা বিষয়ে গল্প করতেও ছাড়েন না। তাঁরা তখন এমনভাবে সেই গল্প করেন, তাঁরা যেন ধোয়া তুলসীপাতা। একবার এক ওসি দুঃখ করে গল্প করছিলেন যে তাঁর এক চাচাতো ভাইকে তাঁদের থানার পুলিশ ৫৪ ধারায় ধরে নিয়ে গিয়ে টাকা নিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনি কখনো ৫৪ ধারায় কাউকে গ্রেপ্তার করে টাকা নিয়ে ছাড়েননি? এখন আপনার কেমন লাগছে দেখেন। এখন আপনার যেমন খারাপ লাগছে, আপনি যাদের থেকে টাকা নিয়ে ছেড়ে দেন তাদেরও সে রকম লাগে। এই হলো আমাদের অবস্থা। আমরা কেউই অপরের ঘুষ খাওয়া পছন্দ করি না, কিন্তু সুযোগ পেলে নিজে খেয়ে নিতেও ছাড়ি না।

এবার আসি তদবিরের বিষয়ে। তদবিরও আমার মনে হয় ঘুষের মতো। কারণ তদবিরে অনুপযুক্ত বিষয় উপযুক্ততা পায়। বাংলাদেশে সরকারি সব বিভাগেই তদবির দুর্নীতি আছে। আমি আমার পুলিশ জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে পুলিশের তদবির এবং পুলিশকে তদবিরের বিষয়ে আলোকপাত করব।

পুলিশ কখন কোথায় তদবির করে? মনে করুন, পুলিশের কনস্টেবল পদে লোক নিয়োগ হচ্ছে। এই কনস্টেবল পদে নিয়োগের জন্য লোক বাছাই করার দায়িত্ব জেলার পুলিশ সুপারের। তিনি আবেদনকারীদের শারীরিক যোগ্যতা

যাচাইয়ের পর লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা শেষে যোগ্যদের বাছাই করবেন। এখন কোনো জেলায় ৩০ জন কনস্টেবল পদে নিয়োগের জন্য আবেদনকারীদের বাছাই পরীক্ষা শুরু হলে সেখানে যদি জেলার মন্ত্রী বা এমপি ১০০ জনের একটি তালিকা এসপিকে ধরিয়ে দেন, তাহলে এসপির অবস্থা কী দাঁড়াবে? এমতাবস্থায় অনেক সৎ ভালো পুলিশ সুপারকে অসহায় বোধ করতে দেখেছি। ঘাড় ত্যাড়া পুলিশ অফিসার না হলে এসব তদবির ঠেকানো সম্ভব নয়। আবার ঘাড় ত্যাড়া স্বভাব নিয়ে জেলায় চাকরি করাও সম্ভব নয়। আমাদের দেশের নেতারা নতশিরের অফিসারদের পছন্দ করে বেশি। সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে নিজ নিজ দলের প্রতি অনুগত অফিসারদের। এখানে একটা বিষয় আমি কখনোই বুঝতে পারিনি, সেটা হলো পুলিশে লোক নিয়োগের ব্যাপারে শারীরিক যোগ্যতাই যেখানে মূল বিচার্য, সেখানে এলাকার মন্ত্রী বা এমপি কী করে বুঝবেন কাকে নিয়োগ করা দরকার? কিন্তু সুপারিশ করে পাঠিয়ে দিচ্ছেন তালিকা। এ ধরনের লোকেরা আবার আইন প্রণয়নও করেন!

এই তদবিরের বিষয়ে এক বাস্তব ঘটনা মনে পড়ে গেল। আমি তখন রাঙামাটি জেলায় ওসি (ডিবি) হিসেবে চাকরি করছি। পুলিশ কনস্টেবলদের অফিসার পদে পদোন্নতির পরীক্ষার হলে ডিউটি করছিলাম। একসময় দেখলাম এসপি মহোদয় এক কনস্টেবলের পাশে বসে আছেন। পরীক্ষা শেষে জানালেন, সেই কনস্টেবলের জন্য তদবির এসেছিল তার প্রতি খেয়াল রাখার জন্য। তাই তার পাশে বসে তিনি খেয়াল রাখছিলেন। ফলে সেই কনস্টেবল কিছু লিখতে পারেনি। ফলাফল শূন্য। এসপি সাহেব ইচ্ছে করেই এ কাজ করেছেন। তিনি তদবির পছন্দ করতেন না। আমি সেই এসপিকে পছন্দ করতাম তাঁর দৃঢ়চেতা ব্যক্তিত্বের জন্য। অবশ্য সেই দৃঢ়চেতা ব্যক্তিত্ব নিয়ে তিনি কোনো সমতল জেলায় চাকরি করতে পারেননি। কারণ সমতল জেলায় নেতা বেশি। আর আমরা যারা সেই লিখিত পরীক্ষার খাতা দেখার দায়িত্বে ছিলাম, তিনি আমাদের সবাইকে খাতাসহ অফিসের একটা কক্ষে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়ে বলেছিলেন, খাতা দেখা শেষ করে তারপর বের হতে হবে। তিনি আমাদের জন্য খাবারদাবার সবই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

এভাবে যদি সব জেলায় পরীক্ষা হতো তাহলে আমাদের গরিব কনস্টেবলরা অন্তত লাখ লাখ টাকা খরচ করা থেকে বেঁচে যেত। এই কথাটা আমাদের সিনিয়র অফিসারদের জানা দরকার যে একজন কনস্টেবল যদি লাখ লাখ টাকা ব্যয় করে পদোন্নতি নেয়, পোস্টিং নেয়, তাহলে তারা তো সেই টাকা উসুল করে নেওয়ার চেষ্টায় থাকবে এবং সেটাই স্বাভাবিক। তাহলে নিম্নপদের অফিসারদের দুর্নীতিতে ঠেলে দিচ্ছে কারা? উচ্চপদস্থ হোয়াইট কালার ঘুষখোর অফিসাররাই। অথচ কোনো নিম্নপদস্থ অফিসার যখন ঘুষ বাণিজ্যে ধরা খান, দেখা যায় সেই ঘুষখোর কোনো সিনিয়র অফিসারই তাঁর নিম্নপদস্থ অফিসারকে বিভাগীয় সাজা দিচ্ছেন।

এ তো গেল পুলিশে নিয়োগ ও পদোন্নতি পরীক্ষার তদবিরের বিষয়। আছে পোস্টিং বিষয়েও তদবির। পুলিশ তদবির করে ভালো জেলা ও স্টেশনে পোস্টিং পাওয়ার জন্য। শুধু পুলিশ কেন, ভালো পোস্টিংয়ের তদবির সবাই করে। দেখবেন সরকারের সমর্থক শিক্ষকরা শহরের কলেজ ছেড়ে মফস্বলের কোনো কলেজেই যান না, একইভাবে চিকিৎসকরাও শহরের বাইরে যেতে চান না। এই না যাওয়ার জন্য তাঁরা সরকারি দলের নেতা-পাতিনেতাদের পেছনে পেছনে ঘোরেন। কিন্তু গলাবাজি করার সময় ভালো লোক সেজে গলাবাজি করতেই থাকেন। আজকাল মনে হয়, সরকারি লবি মেনটেইন করলেই হয় না, সাথে নগদ লেনদেনও করতে হয়। কেউ স্বীকার করুক আর না করুক, সংশ্লিষ্ট এলাকার মন্ত্রী বা এমপির মতামত ছাড়া এখন আর থানায় ওসি, উপজেলায় উপজেলা কর্মকর্তা, জেলায় এসপি ও জেলা প্রশাসক নিয়োগ দেওয়া হয় না। এটা গতবার বিএনপি চালু করেছিল, বজায় রেখেছে আওয়ামী লীগও। কারণ এই মতামত এমনি পাওয়া যায় না বা দেয় না। এই মতামতের জন্য ক্যাশ লেনদেন করতে হয়।

সুতরাং লাভজনক বিষয়ে সব নেতাই এককাতারে। যেমন তারা এককাতারে শুল্কবিহীন গাড়ি আমদানিতে। দেশের কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমাদের নেতারা একমত না হলেও নিজেদের ধান্দা এবং লাভের বেলায় তারা সব সময় এক থাকে। সূক্ষ্মভাবে খেয়াল করলে দেখা যায়, একটা সার্কেলিক অর্ডারে চলছে এই ঘুষ বাণিজ্য। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ঘুষ দিয়ে ভালো পোস্টিং আদায় করে নিচ্ছে, ঘুষ আদায় করছে, ভাগ দিচ্ছে আবার পোস্টিং নিচ্ছে। এই দেওয়া-নেওয়ায় সরকারি আমলা, কর্মচারীদের সাথে হাতে হাত রেখে সুশৃঙ্খলভাবে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের রাজনীতিবিদরা।

পুলিশের কাছে তদবির

যে পুলিশ অফিসার রাজনৈতিক তদবিরে পোস্টিং নেয়, তাকে শুনে চলতে হয় রাজনৈতিক নেতাদের তদবিরও। না শুনলে নেতা বলবে, আপনাকে আমি আমার এলাকায় পোস্টিং করে এনেছি আমার কথামতো কাজ করার জন্য। কথামতো কাজ না করলেই বদলি। মনে প্রশ্ন আসতে পারে, অকালীন বদলি কিভাবে হবে? একেবারেই সোজা। নেতা যদি মন্ত্রণালয়ে অভিযোগ করে যে এই অফিসার দিয়ে দলের আর চলবে না, এই অফিসার সব সময় দলের বিপক্ষে কাজ করে! আর কি? সাথে সাথেই বদলি। একবার মন্ত্রণালয়ের কর্তার মনে বা সংশ্লিষ্ট বিভাগের প্রধানের মনে প্রশ্ন আসে না যে যাঁকে ক'দিন আগেই এলাকার নেতা তদবির করে নিয়ে গেল, সেই একই অফিসার আবার ক্ষতির কারণ হয় কিভাবে? তাহলে কি রাষ্ট্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীকে সরকারি দলের আজ্ঞাবহ হয়ে সরকারি দলের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে হবে?

তাছাড়া জেলা-উপজেলায় কর্মরত অফিসারদের চোখ-কান খোলা রেখেই চাকরি করতে হয়। কারণ এলাকায় সরকারি দলও নানা দলে উপদলে বিভক্ত। সে কারণে অফিসারকে খেয়াল রেখেই তদবির বাস্তবায়ন করতে হয়। তদবির অনুযায়ী কাজ করার আগে দেখতে হবে কোন উপদল শক্তিশালী। না হলে ঘোর বিপদ। এসব খেয়াল করে ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র-যুব সংগঠনের নেতা-পাতিনেতারাও। তারাও তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী এলাকায় পুলিশের সাথে দাপট দেখাতে চেষ্টা করে। অফিসাররা সেইসব নেতাকে বড় ভাই ডেকেটেকে কোনোভাবে চাকরি বাঁচিয়ে ইনকামের পথ পরিষ্কার রাখে। যদি কোনো অফিসার পাতিদের কথা না শুনতে চান, তাহলে তাঁকে নির্যাতিতও হতে হয়।

বেশিদিনের কথা নয়। ২০১০ সালে আমি কচুয়া থানায় কর্মরত ছিলাম। একদিন সন্ধ্যায় কলেজের সরকারি ছাত্র সংগঠনের সভাপতি সাঙ্গোপাঙ্গ সাথে নিয়ে এসি ল্যান্ডের অফিসে এসে অফিসারের মাথা ফাটিয়ে দিয়ে যায়, কারণ তিনি সরকারি ভূমি থেকে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করেছেন। সেই স্থাপনাগুলো ছিল সরকারি দলের লোকজনের অথবা সরকারি দলের লোকজন টাকা নিয়ে সরকারি ভূমিতে স্থাপনা তৈরি করিয়েছিল। বিচার আর কি? অফিসারকেই বদলি হতে হয়। কারণ দলের নেতাকর্মী দরকার। অফিসার তো নেতাদের বাসায়ই ঘুরঘুর করছে ডজন ডজন। মনে হচ্ছে, এ কারণেই ব্যক্তিত্বসম্পন্ন অফিসারের সংখ্যা সব বিভাগেই কমে যাচ্ছে। কমে যাচ্ছে পুলিশেও। ডোরাসাপ মার্কা অফিসারে ভরে যাচ্ছে দেশ। ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, মর্যাদাবান অফিসার এখন খুবই কম, যাঁদের সামনে বেআইনি তদবিরে নেতা ভয় পাবে। এই পরিণতির জন্য যেমন দায়ী আমাদের নীতিজ্ঞানহীন রাজনীতি, তেমনি দায়ী সরকারি অফিসার, পুলিশ অফিসারের নিম্ন মানসিকতা।

এখানে একটা বিষয় লক্ষণীয় যে, যারা ক্ষমতায় থাকে না তারা উচ্চৈঃস্বরে বলে, সরকারি কর্মকর্তারা প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী, তাঁরা যেন রাজনীতির বাইরে থাকেন। কারণ রাজনীতি তাঁদের কাজ নয়। কিন্তু ওই একই দল যখন আবার ক্ষমতায় আসে, নেতারা তখন সেকথা বেমালুম ভুলে যায়। তখন তারা চায় সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, পুলিশ–সবাই যেন তাদের কথামতো চলে, প্রচলিত আইন অনুযায়ী নয়। ব্যাপারটা দাঁড়ায় এরকম–তুমি করলে খারাপ, আমি করলে ভালো।

সনতোষ বড়ুয়া: সাবেক পুলিশ কর্মকর্তা, ছড়াকার ও গল্পকার
ইমেইল: sbarua63@gmail.com